# ২৪. হযরত ঈসা *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি ‘ইনজীল’ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি। এই সময়টাকে فتـــرة الرســـل বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী‘আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বিবেচনা করে আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারী হবার দাবীদার খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে ‘আল্লাহ্র পুত্র’ *(তওবাহ ৯/৩০)* বানিয়েছে’। বরং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাঁকে সরাসরি ‘আল্লাহ’ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, তিনি হ’লেন তিন আল্লাহ্র একজন ( ثَالِثُ ثَلَثَةٍ *=মায়েদাহ ৭৩*)। অর্থাৎ ঈসা, মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তারা এটাকে ‘বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য’ বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ‘কাফের’ বলে ঘোষণা করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩)*। কুরআন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছে। আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করব।

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ১৫টি সূরায় ৯৮টি আয়াতে[৯৭] বর্ণিত হয়েছে।

---

৯৭. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/৮৭, ১৩৬, ২৫৩; (২) আলে-ইমরান ৩/৩৫-৬৩=২৯ ,৮৪; (৩) নিসা ৪/১৫৬-১৫৮=৩, ১৬৩, ১৭১-১৭২; (৪) মায়েদাহ ৫/১৭, ৪৬-৪৭, ৭২-৭৫=৪, ৭৮, ১১০-১১৮=৯; (৫) আন‘আম ৬/৮৫; (৬) তওবা ৯/৩০-৩১; (৭) মারিয়াম ১৯/১৬-৪০=২৫; (৮) আম্বিয়া ২১/৯১; (৯) মুমিনূন ২৩/৫০; (১০) আহযাব ৩২/৭; (১১) শূরা ৪২/১৩; (১২) যুখরুফ ৪৩/৫৭-৫৯=৩, ৬৩-৬৫=৩; (১৩) হাদীদ ৫৭/২৭; (১৪) ছফ ৬১/৬, ১৪; (১৫) তাহরীম ৬৬/১২। সর্বমোট = ৯৮টি ॥*

**ঈসার মা ও নানী :**

ঈসা (আঃ)-এর আলোচনা করতে গেলে তাঁর মা ও নানীর আলোচনা আগেই করে নিতে হয়। কারণ তাঁদের ঘটনাবলীর সাথে ঈসার জীবনের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরী'আতে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও চালু ছিল। এসব উৎসর্গীত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হ'ত না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ঈসার নানী অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন, তখন আক্ষেপ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কন্যা প্রসব করেছি'? *(আলে ইমরান ৩৬)*। অর্থাৎ একে দিয়ে তো আমার মানত পূর্ণ হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি উক্ত কন্যাকেই কবুল করে নেন। বস্তুতঃ ইনিই ছিলেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, যিনি ঈসা (আঃ)-এর কুমারী মাতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أفضلُ نساءِ أهلِ الجنةِ خديجةُ بنتِ خُوَيْلدٍ وفاطمةُ بنتِ محمدٍ ومـــريمُ بنـــتِ عمرانَ وآسيةُ بنتِ مُزَاحِمَ امرأةُ فرعونَ، رواه أحمد والطبراني والحاكم عـــن ابن عباس رضـــ

'জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা হ'লেন চারজন: খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং আসিয়া বিনতে মুযাহিম, যিনি ফেরাঊনের স্ত্রী'।[৯৮]

**মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন :**

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا

৯৮. *আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫০৮।*

وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وإِنِّي أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـــذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ- (آل عمران ٣٥-٣٧)-

‘যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা রয়েছে তাকে আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত হিসাবে। অতএব আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আলে ইমরান ৩৫)*। ‘অতঃপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি! অথচ আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সে কি প্রসব করেছে। (আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) এই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম ‘মারিয়াম’। (মারিয়ামের মা দো‘আ করে বলল, হে আল্লাহ!) আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ’তে’ *(৩৬)*। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর তার প্রভু তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। (অতঃপর ঘটনা হ’ল এই যে,) যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাদ্য দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারিয়াম! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল? মারিয়াম বলত, ‘এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করে থাকেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীত সন্তান পালন করাকে তখনকার সময়ে খুবই পুণ্যের কাজ মনে করা হ’ত। আর সেকারণে মারিয়ামকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে লটারীর ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর বয়োবৃদ্ধ নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*।

**ঈসার জন্ম ও লালন-পালন :**

এভাবে মেহরাবে অবস্থান করে মারিয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আঃ) সর্বদা তাকে দেখাশুনা করতেন। মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে সম্ভবতঃ খেজুর বাগান ও ঝর্ণাধারা ছিল। যেখানে মারিয়াম পর্দা টাঙিয়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি করতেন। অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারিয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا- (مريم ١٦-٢١)-

(হে মুহাম্মাদ!) 'আপনি এই কিতাবে মারিয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হ'তে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল' *(মারিয়াম ১৬)*। 'অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের 'রূহ' (অর্থাৎ জিব্রীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল' *(১৭)*। 'মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও' *(১৮)*। 'সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব' *(১৯)*। 'মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই' *(২০)*। 'সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন

ও আমাদের পক্ষ হ’তে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়’ *(মারিয়াম ১৯/১৬-২১)*। অতঃপর জিব্রীল মারিয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক মারলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হ’ল *(আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)*। অন্য আয়াতে একে ‘আল্লাহ্র কলেমা’ (بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) অর্থাৎ ‘কুন্’ (হও) বলা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*।

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا- فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا- فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا- (مريم ٢٢-٢٦)-

‘অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল’ *(মারিয়াম ২২)*। ‘এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম’ *(২৩)*। ‘এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন’ *(২৪)*। ‘আর তুমি খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে’ *(২৫)*। ‘তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহ্র জন্য ছিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না’ *(মারিয়াম ১৯/২২-২৬)*।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম-পূর্ব কালের বিভিন্ন শরী‘আতে সম্ভবতঃ ছিয়াম পালনের সাথে অন্যতম নিয়ম ছিল সারাদিন মৌনতা অবলম্বন করা। হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কেও সন্তান প্রদানের নিদর্শন হিসাবে তিন দিন ছিয়ামের সাথে মৌনতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঐ অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে

কথা বলার অবকাশ ছিল *(মারিয়াম ১৯/১০-১১)*। একইভাবে মারিয়ামকেও নির্দেশ দেওয়া হ'ল *(মারিয়াম ১৯/২৬)*।

**আলোচনা :**

(১) যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক, তাই তার গর্ভধারণের মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত ছিল বলেই ধরে নিতে হবে। নয় মাস দশদিন পরে সন্তান প্রসব শেষে চল্লিশ দিন 'নেফাস' অর্থাৎ রজঃস্রাব হ'তে পবিত্রতার মেয়াদও এখানে ধর্তব্য না হওয়াই সমীচীন। অতএব ঈসাকে গর্ভধারণের ব্যাপারটাও যেমন নিয়ম বহির্ভূত, তার ভূমিষ্ঠ হওয়া ও তার মায়ের পবিত্রতা লাভের পুরা ঘটনাটাই নিয়ম বহির্ভূত এবং অলৌকিক। আর এটা আল্লাহ্‌র জন্য একেবারেই সাধারণ বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম হবে, মাকে দশ মাস গর্ভধারণ করতে হবে ইত্যাদি নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং এই নিয়ম ভেঙ্গে সন্তান দান করাও তাঁরই এখতিয়ার। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ- (آل عمران ٥٩-٦٠)-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হ'ল আদমের মত। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল'। 'যা তোমার প্রভু আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)*। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, যে বনু ইস্রাঈলের নবী ও রাসূল হয়ে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটলো, সেই ইহুদী-নাছারারাই আল্লাহ্‌র উক্ত ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করেছে। অথচ এই হতভাগারা মারিয়ামের পূর্বদিকে যাওয়ার অনুসরণে পূর্বদিককে তাদের ক্বিবলা বানিয়েছে।[৯৯]

---

*৯৯. ঈসার জন্মের স্থানটিকে এখন Bethlehem (بيت لحم) বলা হয়। যা উত্তর কুদ্স থেকে ৮ কি:মি: দক্ষিণে অবস্থিত এবং ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরে ইস্রাঈলের দখলীভুক্ত।- লেখক ॥*

(২) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মারিয়ামকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয়। এটাতে বুঝা যায় যে, ওটা ছিল তখন খেজুর পাকার মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। আর খৃষ্টানরা কথিত যীশু খৃষ্টের জন্মদিন তথা তাদের ভাষায় X-mas Day বা বড় দিন উৎসব পালন করে থাকে শীতকালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। অথচ এর কোন ভিত্তি তাদের কাছে নেই। যেমন কোন ভিত্তি নেই মুসলমানদের কাছে ১২ই রবীউল আউয়াল একই তারিখে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনের। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী রাসূলের জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ও মৃত্যুর তারিখ ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার।

ইসলামে কারু জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান নেই। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান বাহিনীর বড় দিন পালনের দেখাদেখি ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী *(৫৮৬-৬৩২ হিঃ)*-এর মাধ্যমে কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথা প্রথম চালু হয়। এই বিদ‘আতী প্রথা কোন কোন মুসলিম দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

(৩) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন সদ্য প্রসূত সন্তানের মায়ের পক্ষে। এর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেকীর কাজে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে বান্দাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। যত সামান্যই হৌক কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাতেই বরকত দিবেন। যেমন তালূত ও দাঊদকে আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং যেমন শেষনবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন বিশেষভাবে হিজরতের রাত্রিতে মক্কা ত্যাগের সময়, হিজরতকালীন সফরে এবং বদর ও খন্দক যুদ্ধের কঠিন সময়ে। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে, মারিয়ামের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রসব পরবর্তী পবিত্রতা অর্জন সবই ছিল অলৌকিক এবং সবই অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব। আল্লাহ বলেন,

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- (مريم ٢٧-٢٨)-

'অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছ'। 'হে হারূণের বোন![১০০] তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না' *(মারিয়াম ১৯/২৭-২৮)*। কওমের লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহ্র দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা কওমের লোকেরা জানে না। আল্লাহ বলেন,

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا- وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا- (مريم ٢٩-٣٣)-

'অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব'? *(মারিয়াম ২৯)*। ঈসা তখন বলে উঠল, 'আমি আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন' *(৩০)*। 'আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে' *(৩১)*। 'এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি' *(৩২)*। 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব' *(মারিয়াম ১৯/২৯-৩৩)*।

---

১০০. *মারিয়ামের এক ইবাদতগুযার ভাইয়ের নাম ছিল হারূণ। অথবা হারূণ (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কারণেও এটা বলা হ'তে পারে (কুরতুবী)।*

ঈসার উপরোক্ত বক্তব্য শেষ করার পর সংশয়বাদী ও বিতর্ককারী লোকদের উদ্দেশ্যে করে আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ- مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- وَإِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ- (مريم ٣٤-٣٦)-

‘ইনিই হ’লেন মারিয়াম পুত্র ঈসা। আর ওটাই হ’ল সত্যকথা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে), যে বিষয়ে লোকেরা (অহেতুক) বিতর্ক করে থাকে’ *(মারিয়াম ৩৪)*। ‘আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (যেমন অতিভক্ত খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, ঈসা ‘আল্লাহ্র পুত্র’)। তিনি মহাপবিত্র। যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! ব্যস, হয়ে যায়’ *(৩৫)*। ‘ঈসা আরও বলল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। (মনে রেখ) এটাই হ’ল সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৪-৩৬)*।

কিন্তু সদ্যপ্রসূত শিশু ঈসার মুখ দিয়ে অনুরূপ সারগর্ভ কথা শুনেও কি কওমের লোকেরা আশ্বস্ত হ’তে পেরেছিল? কিছু লোক আশ্বস্ত হ’লেও অনেকে পারেনি। তারা নানা বাজে কথা রটাতে থাকে। তাদের ঐসব বাক-বিতণ্ডার প্রতি ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لَكِنِ الظَّالِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ- (مريم ٣٧-٣٨)-

‘অতঃপর তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন (মত ও পথে) বিভক্ত হয়ে গেল (দুনিয়াতে যার শেষ হবে না)। অতএব ক্বিয়ামতের মহাদিবস আগমন কালে অবিশ্বাসী কাফিরদের জন্য ধ্বংস’। ‘সেদিন তারা চমৎকারভাবে শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা সবাই আমাদের কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে’ *(মারিয়াম ১৯/৩৭-৩৮)*।

**মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য :**

আল্লাহ পাক নিজেই মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ- (التحريم ١٢)-

'তিনি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ইমরান তনয়া মারিয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ হ'তে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল এবং সে ছিল বিনয়ীদের অন্যতম' *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

**মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ :**

(১) তিনি ছিলেন বিশ্ব নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া এবং আল্লাহ্র মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব *(আলে ইমরান ৩/৪২)*।

(২) তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্র উপাসনায় রত, বিনয়ী, রুকু কারিনী ও সিজদাকারিনী *(ঐ, ৩/৪৩)*।

(৩) তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী এবং আল্লাহ্র আদেশ ও বাণী সমূহের বাস্তবায়নকারিনী *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(৪) আল্লাহ নিজেই তার নাম রাখেন 'মারিয়াম' *(আলে ইমরান ৩/৩৬)*। অতএব তিনি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যবতী।

**শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:**

(১) মারিয়াম ছিলেন তার মায়ের মানতের সন্তান এবং তার নাম আল্লাহ নিজে রেখেছিলেন।

(২) মারিয়ামের মা দো'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ'তে এবং আল্লাহ সে দো'আ কবুল করেছিলেন উত্তমরূপে। অতএব মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসার পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৩) মারিয়াম আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে রত ছিলেন এবং তাকে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশেষ ফল-ফলাদির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হ'ত *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্রাত্মা মহিলাগণ মসজিদের খিদমত করতে পারেন এবং আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য যেকোন স্থানে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন।

(৪) মারিয়ামের গর্ভধারণ ও ঈসার জন্মগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ পাক নিয়মের স্রষ্টা এবং তিনিই নিয়মের ভঙ্গকারী। তাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করার মত কেউ নেই। তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পিতা ছাড়াই শুধু মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন।

(৫) ঈসার জন্ম গ্রীষ্মকালে হয়েছিল খেজুর পাকার মওসুমে। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের সময়ে নয়।

(৬) ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা অদৃশ্য থেকে নেককার বান্দাকে আল্লাহ্র হুকুমে সাহায্য করে থাকেন। যেমন জিব্রীল মানবাকৃতি ধারণ করে মারিয়ামের জামায় ফুঁক দিলেন। অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়ায দিয়ে তার খাদ্য ও পানীয়ের পথ নির্দেশ দান করলেন।

(৭) বান্দাকে কেবল প্রার্থনা করলেই চলবে না, তাকে কাজে নামতে হবে। তবেই তাতে আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। যেমন খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নাড়া দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্র হুকুমে সুপক্ক খেজুর সমূহ পতিত হয়।

(৮) বিশেষ সময়ে আল্লাহ্র হুকুমে শিশু সন্তানের মুখ দিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ বের হ'তে পারে। যেমন ঈসার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তার মায়ের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য। বুখারী শরীফে বর্ণিত বনু ইস্রাঈলের জুরায়েজ-এর ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০১]

(৯) ঈসা কোন উপাস্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন অন্যদের মত আল্লাহ্র একজন দাস মাত্র এবং তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একজন সম্মানিত নবী ও কিতাবধারী রাসূল।

---

১০১. *বুখারী, হা/২৪৮২ ‘মাযালিম’ অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ।*

(১০) ঈসা যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, কুরআনের সর্বত্র তাঁকে 'মারিয়াম-পুত্র' (عيسى ابن مريم) বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৮৭, ২৫৩; আলে ইমরান ৩/৪৫ প্রভৃতি)*। পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে হয়তবা তাঁকে কেবল ঈসা বলেই সম্বোধন করা হ'ত, যেমন অন্যান্য নবীগণের বেলায় করা হয়েছে। অথচ মারিয়ামকে তার পিতার দিকে সম্বন্ধ করে 'মারিয়াম বিনতে ইমরান' (ابنت عمران) 'ইমরান-কন্যা' বলা হয়েছে *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(১১) একমাত্র মারিয়ামের নাম ধরেই আল্লাহ তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন *(তাহরীম ৬৬/১২)*। যা পৃথিবীর অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে করা হয়নি। অতএব যাবতীয় বিতর্কের অবসানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া আল্লাহ তাঁকে 'ছিদ্দীক্বাহ' অর্থাৎ কথায় ও কর্মে 'সত্যবাদীনী' আখ্যা দিয়েছেন *(মায়েদাহ ৫/৭৫)*। যেটা অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে দেওয়া হয়নি।

**ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :**

(১) তিনি ছিলেন বিনা বাপে পয়দা বিশ্বের একমাত্র নবী *(আলে ইমরান ৩/৪৬ প্রভৃতি)*। (২) আল্লাহ স্বয়ং যার নাম রাখেন মসীহ ঈসা রূপে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৩) তিনি শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ'তে মুক্ত ছিলেন *(ঐ, ৩/৩৬-৩৭)*। (৪) দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি ছিলেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়জনদের অন্যতম *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৫) তিনি মাতৃক্রোড়ে থেকেই সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন *(মারিয়াম ১৯/২৭-৩৩; আলে ইমরান ৩/৪৬)*। (৬) তিনি বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৪৯)* এবং শেষনবী 'আহমাদ'-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন *(ছফ ৬১/৬)*। (৭) তাঁর মো'জেযা সমূহের মধ্যে ছিল- (ক) তিনি মাটির তৈরী পাখিতে ফুঁক দিলেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যেত (খ) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন (গ) তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন (ঘ) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ী থেকে যা খেয়ে আসে এবং যা সে ঘরে সঞ্চিত রেখে আসে *(আলে ইমরান ৩/৪৯; মায়েদাহ ৫/১১০)*।

(৮) তিনি আল্লাহ্র কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। তবে তওরাতে হারামকৃত অনেক বিষয়কে তিনি হালাল করেন *(আলে ইমরান ৩/৫০)*। (৯) তিনি ইহুদী চক্রান্তের শিকার

হয়ে সরকারী নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ফলে আল্লাহ তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন *(আলে ইমরান ৩/৫২, ৫৪-৫৫; নিসা ৪/১৫৮)*। শত্রুরা তাঁরই মত আরেকজনকে সন্দেহ বশে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে এবং তারা নিশ্চিতভাবেই ঈসাকে হত্যা করেনি’ *(নিসা ৪/১৫৭)*। (১০) তিনিই একমাত্র নবী, যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় সশরীরে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল, ক্রুশ, শূকর প্রভৃতি ধ্বংস করবেন। অতঃপর ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন।[১০২]

### হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী :

সাধারণতঃ সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আঃ) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুঅত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পৌঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন।

### ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত :

ঈসা (আঃ) নবুঅত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন, يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَـــدُ– ‘হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি **(১)** আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে **(২)** আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং **(৩)** আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসাবে, যার নাম হবে আহমাদ’... *(ছফ ৬১/৬)*। তিনি বললেন, وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُـــدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ‘**(৪)** নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৬)*।

---

১০২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫-৭ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫, ঐ, ‘ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২*।

তিনি বললেন, وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّـذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ- (آل عمران ٥٠)-

'আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, **(৫)** আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর **(৬)** আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ। অতএব **(৭)** তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর' *(আলে ইমরান ৩/৫০)*।

এটার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে যে,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَـبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً- (النساء ١٦٠-١٦١)-

'বস্তুতঃ ইহুদীদের পাপের কারণে আমরা তাদের উপরে হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা ছিল **(১)** আল্লাহ্র পথে তাদের অধিক বাধা দানের কারণে'। 'এবং এ কারণে যে, **(২)** তারা সূদ গ্রহণ করত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, **(৩)** তারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করত। বস্তুতঃ আমরা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৬০-১৬১)*। তিনি আরও বলেন,

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَـا عَلَـيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْـتَلَطَ بِعَظْـمٍ ذَلِـكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُوْنَ- (الأنعام ١٤٦)-

'এবং ইহুদীদের জন্য আমরা **(১)** প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম এবং **(২)** ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী' *(আন'আম ৬/১৪৬)*।

**ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন :**

তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি বনু ইস্রাঈলকে তাঁর আনীত নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

وَرَسُوْلاً إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- (آل عمران ٤٩)-

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। (যেমন-) **(১)** আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্র হুকুমে। **(২)** আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং **(৩)** ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। **(৪)** আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্র হুকুমে। **(৫)** আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(আলে ইমরান ৩/৪৯)*।

উল্লেখ্য যে, যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তি সহ নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন মূসার সময় মিসরে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব। ফলে আল্লাহ তাঁকে লাঠির মো‘জেযা দিয়ে পাঠালেন। অনুরূপভাবে ঈসার সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সেকারণ ঈসাকে আল্লাহ উপরে বর্ণিত অলৌকিক ক্ষমতা ও মো‘জেযা সমূহ দিয়ে পাঠান। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবরা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকারে ভূষিত ছিল। ফলে কুরআন তাদের সামনে হতবুদ্ধিকারী মো‘জেযা রূপে নাযিল হয়। যাতে আরবের স্বনামখ্যাত কবিরা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

**দাওয়াতের ফলশ্রুতি :**

ঈসা (আঃ)-এর মো‘জেযা সমূহ দেখে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরীব শ্রেণীর কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ’লেও দুনিয়াদার সমাজ নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইস্রাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আঃ)-কে ‘জাদুকর’ বলে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, (হে ঈসা!) إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هَـــذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ- (المائدة ١١٠)- ‘যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ব্যতীত কিছুই নয়’ *(মায়েদাহ ৫/১১০)*।

উক্ত অপবাদে ঈসা (আঃ) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় অতীব নোংরা পথ। তারা তাঁর মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আঃ) অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুঅতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আঃ)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবার তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল। তারা অনবরত বাদশাহ্র কান ভারি করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহ দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদীদের এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল প্রেরণ করেন এবং ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন।

**ইহুদীদের উপর প্রেরিত গযব ও তার কারণ সমূহ :**

ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ ইহুদী কাফিরদের উপরে নানাবিধ দুনিয়াবী গযব নাযিল করেন। তাদেরকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল- সে বিষয়ে অনেকগুলি কারণের মধ্যে আল্লাহ বলেন,

Contents



فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ قَلِيْلاً- وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيْماً- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَـــكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْناً- بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكِيْماً- (النساء ١٥٥-١٥٨)-

‘তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল (১) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, (২) অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং (৩) তাদের এই উক্তির কারণে যে, ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন’... *(নিসা ১৫৫)*। ‘আর (৪) তাদের কুফরীর কারণে এবং (৫) মারিয়ামের প্রতি মহা অপবাদ আরোপের কারণে’ *(১৫৬)*। ‘আর তাদের (৬) একথার কারণে যে, ‘আমরা মারিয়াম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছিল, না শূলে চড়িয়েছিল। বরং তাদের জন্য ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানাবিধ কথা বলে। তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করা ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি’ *(১৫৭)*। ‘বরং তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হ’লেন মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(নিসা ৪/১৫৫-১৫৮)*।

**ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার ১০টি কারণ :**

সূরা নিসা ১৫৫-৬১ আয়াতে ইহুদীদের ইপর আল্লাহ্র গযব নাযিলের ও তাদের অভিশপ্ত হওয়ার যে কারণ সমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) তাদের ব্যাপক পাপাচার (২) আল্লাহ্র পথে বাধা দান (৩) সূদী লেনদেন (৪) অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ (৫) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৬) নবীগণকে হত্যা করা (৭) আল্লাহ্র পথে আগ্রহী না হওয়া এবং অজুহাত দেওয়া যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন (৮) কুফরী করা (৯) মারিয়ামের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (১০) ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার মিথ্যা দাবী করা।

**ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহন :**

তৎকালীন রোম সম্রাট ছাতিয়ূনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতারের জন্য সরকারী বাহিনী ও ইহুদী চক্রান্তকারীরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরি মধ্যে আল্লাহ্র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে।

ইহুদী-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, 'এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি' *(নিসা ৪/১৫৭)*। বরং তার মত কাউকে তারা হত্যা করেছিল ।

উল্লেখ্য যে, ঈসা (আঃ) তাঁর উপরে বিশ্বাসী সে যুগের ও পরবর্তী যুগের সকল খৃষ্টানের পাপের বোঝা নিজে কাঁধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খৃষ্টানদের দাবী স্রেফ প্রতারণা ও অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

**আল্লাহ্র পাঁচটি অঙ্গীকার :**

ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাঁচটি ওয়াদা করেছিলেন এবং সবক'টিই তিনি পূর্ণ করেন। (১) হত্যার মাধ্যমে নয় বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে (২) তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে (৩) তাকে শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে (৪) অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে ঈসার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী রাখা হবে এবং (৫) ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। এ বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ- (آل عمران ٥٥)-

‘আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে রাখবো। অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যকার বিবাদীয় বিষয়ে ফায়ছালা করে দেব’ *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مُتَوَفِّيْكَ অর্থ ‘আমি তোমাকে ওফাত দিব’। ‘ওফাত’ অর্থ পুরোপুরি নেওয়া। মৃত্যুকালে মানুষের আয়ু পূর্ণ হয় বলে একে ‘ওফাত’ বলা হয়। রূপক অর্থে নিদ্রা যাওয়াকেও ওফাত বা মৃত্যু বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا– ‘আল্লাহ মানুষের প্রাণ নিয়ে নেন তার মৃত্যুকালে, আর যে মরেনা তার নিদ্রাকালে’ *(যুমার ৩৯/৪২)*। সেকারণ যাহহাক, ফাররা প্রমুখ বিদ্বানগণ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ -এর অর্থ বলেন, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় (পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে) স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব। এখানে বর্ণনার আগপিছ হয়েছে মাত্র’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যা কুরআনের বহু স্থানে হয়েছে। ঈসার অবতরণ, দাজ্জাল নিধন, পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সকল বড় বড় নবীই হিজরত করেছেন। এক্ষণে পৃথিবী থেকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া, অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা- এটা ঈসা (আঃ)-এর জন্য এক ধরনের হিজরত বৈ কি! পার্থক্য এই যে, অন্যান্য নবীগণ দুনিয়াতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করেছেন। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে আসমানে হিজরত করেছেন। অতঃপর আসমান থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত এবং তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী।

অতঃপর ঈসার অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ ঈমানী বিজয় এবং সেটি ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ঈমানী বিজয়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় যেমন খেলাফত যুগে হয়েছে,

ভবিষ্যতে আবারও সেটা হবে। এমনকি কোন বস্তিঘরেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে বাকী থাকবে না। সবশেষে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ঈসা ও মাহদীর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয় সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হবে।[১০৩]

## ‘হাওয়ারী’ কারা?

حَوَارِىّ শব্দটি حَوَرٌ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অর্থ দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য ধবধবে সাদা চুন। পারিভাষিক অর্থে ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি অনুসারী শীর্ষস্থানীয় ভক্ত ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে ‘হাওয়ারী’ বলা হ’ত। কেউ বলেছেন যে, নাবাত্বী ভাষায় হাওয়ারী অর্থ ধোপা (القصار)। ঈসার খাঁটি অনুসারীগণ ধোপা ছিলেন, যারা কাপড় ধৌত করতেন। পরে তারা ঐ নামেই পরিচিত হন। অথবা এজন্য তাদের উপাধি ‘হাওয়ারী’ ছিল যে, তারা সর্বদা সাদা পোষাক পরিধান করতেন। কোন কোন তাফসীরবিদ তাঁদের সংখ্যা ১২ জন বলেছেন। ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে যেমন ‘হাওয়ারী’ বলা হয়; শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে তেমনি ‘ছাহাবী’ বলা হয়। আভিধানিক অর্থে ছাহাবী অর্থ সাথী বা সহচর হ’লেও পারিভাষিক অর্থে রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্যদের সাথীগণকে ‘ছাহাবী’ বলা হয় না। কেননা এই পরিভাষাটি কেবল ঐসকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ‘হাওয়ারী’ শব্দটি কোন কোন সময় শুধু ‘সাহায্যকারী’ বা আন্তরিক বন্ধু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, ‘প্রত্যেক নবীর একজন ‘হাওয়ারী’ অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে। তেমনি আমার ‘হাওয়ারী’ হ’ল যুবায়ের’।[১০৪]

ঈসা (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলের স্বার্থবাদী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত বুঝতে পারলেন, তখন নিজের একনিষ্ঠ সাথীদের বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার সত্যিকারের ভক্ত ও অনুসারী কারা? একথাটিই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

---

১০৩. *আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৭৫, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।*

১০৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১০১ ‘মানক্বিব’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ- (آل عمران ٥٢-٥٣)-

‘যখন ঈসা বনু ইস্রাঈলের কুফরী অনুধাবণ করলেন, তখন বললেন, কারা আছ আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহ্র পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সেই সব বিষয়ের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও’ *(আলে ইমরান ৩/৫২-৫৩)*

অন্যত্র এসেছে এভাবে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوْا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ- (الصف ١٤)-

‘হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্র জন্য আমাকে সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্র সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একটি দল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের উপরে। ফলে তারা বিজয়ী হ’ল’ *(ছফ ৬১/১৪)*।

অবশ্য হাওয়ারীদের এই আনুগত্য প্রকাশের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে। যেমন তিনি বলেন,

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ- (المائدة ١١١)-

'আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী' *(মায়েদাহ ৫/১১১)*। এখানে হাওয়ারীদের নিকট 'অহি' করা অর্থ তাদের হৃদয়ে বিষয়টি সঞ্চার করা বা জাগ্রত করা। এটা নবুঅতের 'অহি' নয়।

বস্তুতঃ শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাথে সাথে বার জন ভক্ত অনুসারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। অতঃপর তারাই ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। যদিও পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে বহু ভেজাল ঢুকে পড়ে এবং তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আজও বিশ্ব খৃষ্টান সমাজ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট নামে প্রধান দু'দলে বিভক্ত। যাদের রয়েছে অসংখ্য উপদল। আর এরা সব দলই ভ্রান্ত।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) সূরা ছফ ১৪ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পর খৃষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাকে 'আল্লাহ' বলে। একদল তাঁকে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলে এবং একদল তাকে 'আল্লাহ্র দাস ও রাসূল' বলে। প্রত্যেক দলের অনুসারী দল ছিল। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়তে থাকে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং তিনি মুমিনদের দলকে সমর্থন দেন। ফলে তারাই দলীলের ভিত্তিতে জয়লাভ করে। বলা বাহুল্য মুমিন ঈসায়ীগণ সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। 'বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন ও তারা বিজয়ী হ'ল' বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। যারা ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয় নবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হয়েছেন।

**আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য অবতরণ :**

মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে মান্না ও সালওয়ার জান্নাতী খাবার নামিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা হাওয়ারীগণ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে অনুরূপ দাবী করে বসলো। বিষয়টির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِـــدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوْا اللهَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ- قَالُوْا نُرِيْدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَـــا وَآيَـــةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ- قَالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- (المائدة ١١٢-١١٥)-

‘যখন হাওয়ারীরা বলল, হে মারিয়াম-পুত্র ঈসা! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর’ *(মায়েদাহ ১১২)*। ‘তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে চাই, আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে এবং আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন ও আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব’ *(১১৩)*। ‘তখন মরিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন। তা আমাদের জন্য তথা আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ হ’তে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রূযী দান করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা’ *(১১৪)*। ‘আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতে অপর কাউকে দেব না’ *(মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত খাদ্য সঞ্চিত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তিরমিযীর একটি হাদীছে আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত খাদ্যভর্তি খাঞ্চা আসমান হ’তে নাযিল হয়েছিল এবং হাওয়ারীগণ তৃপ্তিভরে খেয়েছিল। কিন্তু লোকদের মধ্যে কিছু লোক তা সঞ্চিত রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।[১০৫]

---

*১০৫. আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩০৬১, ‘তাফসীর’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫০ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘ন্যায় কাজের আদেশ’ অনুচ্ছেদ-২২।*

### ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন :

ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহনের ফলে ঈসায়ীদের মধ্যে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তারা যে কুফরীতে লিপ্ত হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (المائدة ١١٦-١١٨)-

‘যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন, আপনি মহাপবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। বস্তুতঃ আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি জানি না কি আপনার মনের মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত’ *(মায়েদাহ ১১৬)*। ‘আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, কেবল সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। বস্তুতঃ আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত’ *(১১৭)*। ‘এক্ষণে যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ’ *(মায়েদাহ ৫/১১৬-১১৮)*।

Contents



উপরোক্ত ১১৭নং আয়াতে বর্ণিত فَلَمَّا تَـــوَفَّيْتَنِيْ বাক্যটিতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল তালাশ করার এবং তাঁর ঊর্ধ্বারোহনের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এ কথোপকথনটি ক্বিয়ামতের দিন হবে। যার আগে আসমান থেকে অবতরণের পর দুনিয়ায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যাবে।[১০৬]

**ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :**

হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতী জীবন থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ জানতে পারি। যেমন-

(১) পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশের হাযার হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁর পূর্বেকার সকল নবী এবং তিনি নিজে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল বনু ইস্রাঈল তথা স্ব স্ব গোত্রের প্রতি আগমন করলেও শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতি বিশ্বনবী হিসাবে। অতএব ঈসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত শেষনবী ‘আহমাদ’ বা মুহাম্মাদ-এর অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীই হ’ল ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী ও প্রকৃত উত্তরসুরী। নামধারী খৃষ্টানরা নয়।

(২) মু‘জেযা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখানো যায় বা চুপ করানো যায়। কিন্তু হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত আবশ্যক। যেমন ঈসা (আঃ)-কে যে মু‘জেযা দেওয়া হয়েছিল, সে ধরনের মু‘জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর জন্মটাই ছিল এক জীবন্ত মু‘জেযা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুরা হেদায়াত লাভ করেনি।

---

*১০৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ক্বিয়ামত প্রাক্কালের নিদর্শন সমূহ ও দাজ্জালের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ-৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭, ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫।*

(৩) সবকিছু মানবীয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। বরং সর্বদা এলাহী সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসী ও আকাংখী থাকতে হয়। যেমন মারিয়াম ও তৎপুত্র ঈসার জীবনের  প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, স্বার্থপর ও দুনিয়া পূজারী সমাজ নেতারা তাদের শত্রু হয় এবং পদে পদে বাধা দেয়। কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও তারা পেয়ে থাকেন। যেমন ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন।

(৫) দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নির্যাতিত হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই বিজয়ী হন এবং সারা বিশ্ব তাদেরই ভক্ত ও অনুসারী হয়। ঈসা (আঃ)-এর জীবন তারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ–